– প্রথম অধ্যায় –

অভিজিৎ সেন ঃ জীবন, সৃষ্টি ও সাহিত্যভাবনা

প্রথম অধ্যায়

অভিজিৎ সেন ঃ জীবন, সৃষ্টি ও সাহিত্যভাবনা

বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বৃহৎ প্রকাশনগোষ্ঠীর আনুকূল্যধন্য তথাকথিত মূলস্রোতের বাংলা আখ্যান ধারার বিপরীতে, প্রধানত ছোট কাগজগুলিকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন একঝাঁক প্রতিশ্রুতিবান লেখক। বিষয়বোধে, আঙ্গিকচিন্তায় কথাসাহিত্যের এক বিকল্প স্রোতের স্থপতি তাঁরা। তথাকথিত মূলস্রোতের সাহিত্য মুখ্যত দেশ কালের বাস্তব পটপ্রেক্ষিতের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের কাম প্রেমের কাহিনি হয়েই রয়ে গেছিল বিগত কয়েক বছর ধরে। সমকালীন রাজনীতি সমাজ অর্থনীতির চাপে নাভিশ্বাস ওঠা গরিষ্ঠভাগ মানুষের জীবন বিনোদনবিলাসী সাহিত্যকার ও পাঠকের চোখে হয়ে গেছিল একেবারে অনুজ্জ্বল। অথচ বাস্তবে সংগ্রামশীল ও ভীষণ গতিময় এই জীবন প্রবাহকে নানা দিক থেকে কথাবয়নে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন একদল শক্তিমান লেখক। সত্তরের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যের এই যে নতুন পথ চলার সূচনা সেই পথেরই একজন অগ্রণী দিশারি হলেন লেখক অভিজিৎ সেন। লেখকের রচনা আমাদের কেবল মুগ্ধই করে না, প্রেরণা দেয় তাঁর চিন্তা-চেতনার বিস্তৃতি, আশ্চর্য করে তাঁর বিষয়বোধের বৈচিত্র, ভাবনার বিশালতা। লেখকের গভীর বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণক্ষমতা মুগ্ধ করে। ব্যক্তিগত জীবনে সমাজের বহুধাবিস্তৃত পরিমণ্ডলের সাথে গভীর সংযোগ এই পর্যবেক্ষণক্ষমতার পেছনে একটি অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছে– এতে সন্দেহ নেই। অভিজিৎ সেনের নির্বাচিত কথাসাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা আমাদের এই সন্দর্ভের লক্ষ, আলোচনার উপক্রমণিকায় আমরা ব্যক্তি অভিজিৎ সেন, তাঁর জীবন, সৃষ্টি ও সাহিত্যভাবনার একটি প্রতিবেদন এই প্রবেশক অধ্যায়ে উপস্থাপিত করতে চাই।

লেখক অভিজিৎ সেনের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৮ শে জানুয়ারি অবিভক্ত ভারতবর্ষের বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে। লেখকের পিতার নাম সুধীর কুমার সেন ও মায়ের নাম লাবণ্যপ্রভা সেন। লেখকেরা আট ভাই এবং পাঁচ বোন। লেখক তাঁর পিতার ষষ্ঠ এবং মাতার তৃতীয় সন্তান। তাঁর পিতামহের নাম শ্রী অবিনাশ চন্দ্র সেন ও পিতামহীর নাম শ্রীমতী ক্ষিরোদাসুন্দরী দেবী। লেখকের মাতামহের নাম বসন্ত গুপ্ত। লেখকের জীবনে তাঁর মাতা পিতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। লেখক তাঁর পিতা মাতার প্রসঙ্গে বলেন,

"আমার বাবা-মা দেশস্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত স্বচ্ছল ভূস্বামী পরিবারের মানুষ ছিলেন। স্বাধীনতার পর ব্যাপারটা পুরো উল্টো হয়ে যায়। বাবা তাঁর সময়ের অনুরূপ অলস, শ্রমবিমুখ সামন্ততান্ত্রিক মানুষ ছিলেন। মা একান্নবর্তী পরিবারের অনেক সন্তানের জননী। তাঁকে সারাদিনই পরিশ্রম করতে হত। বাবা নাটক, অভিনয় এবং হুইল ছিপে মাছ ধরা এসব কাজে খুব অনুরাগী ছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারের অধিকাংশ মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হলেও আমার বাবা-মা উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। মা ভালো গান গাইতে পারতেন। বাবাকে শেক্সপিয়ার, বার্নাড শ এবং ইবসনের নাটক পড়তে এবং আলোচনা করতে শুনেছি বন্ধুদের সঙ্গে। দেশ ছাড়ার আগে জীবনের পঞ্চাশ বছর পার হওয়ার পর বাবা সম্ভবত বছর দু-তিনের জন্য একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। কলকাতায় আমাকে ছন্দবদ্ধ চিঠি লিখতেন। আমিও কবিতায় তাঁর চিঠির উত্তর দিতাম। সৎ এবং ভালোমানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। স্বচ্ছলতার দিনে বাবার পরোপকারী হিসাবে খ্যাতি ছিল।" [১]

বোঝাই যাচ্ছে, পিতার সাহিত্যানুরাগই অভিজিতের লেখালেখির অন্যতম প্রেরণা উৎস।

অভিজিৎ সেন -এর স্ত্রীর নাম দীপিকা সেন। লেখকের দুই কন্যা, নাম- সুদেষ্ণা

ও শিঞ্জনা। লেখক তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা সম্পর্কে বলেন,

"প্রথম জন পাঁচ ছ বছর বয়স থেকে মৃগী রোগের শিকার, সম্ভবত সেই কারণে আংশিক জড়ধী। দ্বিতীয় মেয়ে বিবাহিত, তাদের একটি ছেলে আছে বছর আটেকের। আমার জীবনে আমার স্ত্রী ও কন্যারা খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এখন পর্যন্ত। সাহিত্য জীবনে খুবই সহানুভূতিশীল।'' [২]

অভিজিৎ সেনের শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি তাঁর জন্মস্থান কেওড়া গ্রামে হলেও লেখক স্কুল ফাইনাল পাশ করেন ঝাড়গ্রাম থেকে ১৯৫৯ সালে ১ম বিভাগে, আই এস সি পাশ করেন ১৯৬১ সালে পুরুলিয়া থেকে ২য় বিভাগে। তিনি কলকাতা সিটি কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে বি এ পাশ করেন, এবং ১৯৬৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস-এ এম এ পাশ করেন।

লেখকের কর্মজীবনের শুরু হয় পড়াশুনা চলাকালেই। প্রথম চাকুরি নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোং লিমিটেডে ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত। পরবর্তী চাকুরি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত এক বছর চারমাসের জন্য ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কে। পরে ১৯৭৬ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উচ্চপদে চাকুরি করেন অবসর গ্রহণ পর্যন্ত। লেখকের কর্মজীবন সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত বক্তব্য জানতে চাইলে লেখক জানান---

"লেখার ব্যাপারে আমার বিস্তৃত কর্মজীবনের অসংখ্য মানুষের সঙ্গে পরিচিতি ব্যাপক অভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়েছে।'' [৩]

ব্যাঙ্কে চাকুরির সূত্রে উত্তর বাংলার অনেক ছোট শহর ও গ্রামে তাঁর বসবাসের অভিজ্ঞতা হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন অভিজিৎ। জেনেছেন বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ সংস্কৃতিও। তাই তাঁর সাহিত্যেও গোটা পশ্চিমবাংলারই উপস্থিতি লক্ষ করি। অবস্থানের বিভিন্নতা, সক্রিয় পর্যবেক্ষণ যে তাঁর

জীবন ও সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল, লেখক নিজেই তা বলেছেন ঃ

"আমার সাহিত্যিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য দিক হচ্ছে,–গ্রাম, নগর এবং মহানগর এই তিন অবস্থানেই আমার অভিজ্ঞতা বেশ ব্যাপক, ...এইসব জায়গার সমাজ, সংস্কৃতি, উন্নয়ন প্রশাসন ও রাজনীতির মধ্যে নানা ভূমিকায় জড়িয়ে পড়ার সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য আমার দুই-ই ব্যাপকভাবে হয়েছে।'' [৪]

একজন দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে অভিজিৎ সেনের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উপাদানগুলিই নানাভাবে উঠে এসেছে তাঁর লেখনীতে।

স্কুলের একেবারে নিচু ক্লাসে অভিজিতের সাহিত্যে হাতেখড়ি। তাঁর প্রকাশিত প্রথম রচনা লেখকের ভাষায় 'কয়েকটি ছেলে মানুষি কবিতা'। লেখক অভিজিৎ সেনের সাহিত্য যাত্রার সূচনা মূলত 'ছোট পত্রিকা' বা 'লিটিল ম্যাগাজিন'কে আশ্রয় করে। লিটিল ম্যাগাজিন এর ভূমিকা লেখকের জীবনে কতখানি এই প্রশ্নের উত্তরে লেখক জানান,

"লিটল ম্যাগাজিনের কাছে আমি এই কারণে কৃতজ্ঞ যে লেখক হওয়াই হয়ে উঠত না যদি এইসব পত্র পত্রিকা না থাকত। আমার গল্প উপন্যাস যদি কিছু লোককেও কিছু দিয়ে থাকে তবে সে কৃতিত্ব মূলত ওই লিটল ম্যাগাজিনওয়ালাদেরই।'' [৫]

অভিজিৎ তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৮৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সুধাবসু স্মৃতিপুরস্কার' লাভ করেন। তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯২ সালে লেখককে 'বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' -এ ভূষিত করে। এছাড়াও লেখক ২০০৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শরৎচন্দ্র স্মৃতিপদক' ও লাভ করেন।

লেখক অভিজিৎ সেন বহু দেশি এবং বিদেশি পূর্বসূরি লেখক-লেখিকাদের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই জনপদপ্রয়াস প্রত্রিকায় দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জানান,

"সত্তরের (গত শতকের) মাঝামাঝি যখন নতুন করে এবং যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে লেখালেখি আবার শুরু করেছিলাম, মহাশ্বেতা দেবী তখন তাঁর নব পর্যায়ের লেখাগুলিতে ক্রমশ আসন দৃঢ় করছিলেন। অসম্ভব আকৃষ্ট হয়েছিলাম 'জল' 'অপারেশন বসাই টুডু' 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' 'শ্রী শ্রী গনেশ মহিমা' 'বিছন' 'দ্রৌপদি' ইত্যাদি গল্প ও উপন্যাসগুলিতে। আমার 'বর্গক্ষেত্র' 'আইন শৃঙ্খলা'—এক কথায় বলতে গেলে 'দেবাংশী' সংকলনের গল্পগুলিতে মহাশ্বেতা দেবীর ছাপ স্পষ্ট।

স্কুলের পড়া শেষ করার আগেই আমি তারাশঙ্করের প্রধান উপন্যাসগুলি শেষ করে ফেলেছিলাম। সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত বয়েসে তারাশঙ্কর আমাকে অভিভূত করেছিলেন। আমার প্রথম দিকের গল্প উপন্যাসের মধ্যে তারাশঙ্কর কোথাও কোথাও হয়ত উঁকি মারেন। সাহিত্য একাডেমি ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে ন্যাশনাল সেমিনারে (১৭-১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯) ভাষণে এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত বলেছি।

পূর্ববর্তী এবং বড়মাপের কথাসাহিত্যিকের রচনা পরবর্তী প্রজন্মের উপরে নানা ভাবে প্রভাব ফেলে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই আমি গোগোল, তুর্গেনিভ, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, গোর্কি পড়েছি। সহজেই প্রাপ্য রুশ ক্লাসিকস ষাট ও সত্তরের দশকে আমাদের মত বহু মানুষকেই মহৎ সাহিত্যের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল। নিজে উপার্জন করা শুরু করি ১৯৬৩ সাল থেকে। তখন বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আরও বিস্তৃত ভাবে পরিচয় হতে শুরু করে। সত্তরের প্রথম দিক থেকে আমার বালুরঘাট বাস স্থায়ী হতে প্রচুর অবসর পেয়ে যাই। সেই সময়ে হেমিংওয়ের প্রধান উপন্যাস এবং গল্প গুলোর বেশি ভাগই পড়ে ফেলি। আশির প্রথমেই নির্মাল্য আচার্যের কাছ থেকে মার্কেজের 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অব সলিচুড' পড়ার জন্য পাই। আশি এবং নব্বইয়ের দশকে মার্কেজের প্রধান লেখাগুলো প্রায় সবই পড়ে ফেলেছিলাম আমি।

অন্য লেখকদের মত এইসব মহান লেখকদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছি আমি।'' [৬]

একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত জায়গা থেকে উৎপীড়িত ও প্রান্তিক মানুষ, যারা ভারতীয় সমাজের প্রায় ৮৫ শতাংশ, তাদের কথাকেই নানাভাবে তুলে ধরেন লেখক অভিজিৎ সেন। তাঁর মতে সময়, সমাজ তথা মানুষ– এর প্রতিটির প্রতিই একজন লেখকের কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। লেখক কখনই সমাজ বিচ্ছিন্ন জীব নন, যিনি কেবল ওপর থেকে সমাজের চিত্র অংকন করে যাবেন। তাঁর ভাষায়,---

"অন্যান্য মানুষদের চেয়ে লেখকই বোধ হয় আগে টের পায় যে একটা নিবাত, নিষ্কম্প, নিরপেক্ষ জায়গায় কারো পক্ষেই থাকা সম্ভব নয়। সমাজবিচ্ছিন্ন, রাজনীতিবিচ্ছিন্ন কথাগুলি মনেহয় কথার কথাই।

প্রত্যেক লেখকই একটি মতাদর্শে আস্থাবান থেকে তার রচনাটি তৈরি করে। ভীষণ নিরপেক্ষ লেখক আসলে ভীষণ চতুর।'' [৭]

তাই নিরপেক্ষ থাকা তাঁর হয়ে ওঠে না। একদিকে তাঁর স্মৃতিকে সদাজাগর রাখে তেভাগা আন্দোলন, অন্যদিকে তিনি ক্ষুব্ধ হন বর্তমান পঞ্চায়েত রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতায়। মুক্তবাজার, পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী উপস্থিতি লেখককে ভাবিত করে। আর এই ভাবনা লেখকের বয়ানে উঠে আসে স্পষ্টভাবে। hypothetical বা অনুমানসাপেক্ষ কথাবার্তা পরিহার করেই বলেন তিনি। নিজেকে বাঁচিয়ে তৈরি করা বানানো কথাগুচ্ছে আস্থাহীন তিনি। অকপট ও স্পষ্ট তাঁর বয়ান– তা তাঁর লেখনিতেই হোক আর সাক্ষাৎকারেই হোক। প্রাগুক্ত সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ বলেছেন –

"দারিদ্র আমি নিজের জীবনে এবং আমাদের গ্রামশহরে অনেক দেখেছি। বলতে পারেন দীর্ঘদিন ধরে প্রায় পুরোটাই দেখেছি।..... দারিদ্র তৈরি করার, বৈষম্য বেড়ে ওঠার পিছনে এই মুহূর্তে একথা নিঃশংসয়ে বলা যায়, বাজার অর্থনীতির সার্বভৌম হয়ে ওঠার কারণই মুখ্য। আমার মতো আপনারও ভাবতে নিশ্চয়ই অবাক লাগে যে, যে

মিডিয়া একযোগে পুজিঁর বাজারে সামান্য আঘাত লাগতে পারে এমন যে কোনো সম্ভাবনা দেখলেই রে রে করে ওঠে, এমনকি শ্রদ্ধেয় কবি সাহিত্যিকদের দিয়েও মিছিল, সভা, বিক্ষোভের মতো সাধারণ প্রতিবাদের বিরুদ্ধেও মরাকান্নার ঢঙে প্রবন্ধ লেখায়, তারাই আবার আমলাশোল, জলঙ্গীর দারিদ্র নিয়ে সব থেকে বেশি সোরগোল তোলে। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু একথা এখনো বোঝানো যায় নি যে কল্যাণ রাষ্ট্রের পরিপূরক হয়ে ওঠার মতো ক্ষমতা পুঁজির আছে। অতি সাধারণ মানুষও বোঝে যে আমলাশোল, জলঙ্গী, কলকাতার ফুটপাতে যারা বসবাস করে, আর তাদের সামান্য উপরে যারা, যারা আটশো থেকে দু হাজার টাকা বেতনে দোকানে দোকানে, পার্লারে, সুদৃশ্য আই টি কিউবিকলসে, বা তাদেরও সামান্য উপরে যারা এবং বেশ খানিকটা উপরে যারা, তারা সবাই জানে মুক্তপুঁজি কিন্তু তাদের কোনো উপকার করে না। জানে, সমাজে যারা সহজ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মধ্যে, বাজার তাদেরই শ্রীবৃদ্ধি করে। Airtel এর একেবারে হালের টিভি বিজ্ঞাপনে একটি ধনী ঘরের শিশুর সঙ্গে একটি যথার্থ পথশিশুর এক্কা-দোক্কা খেলার দৃশ্য আছে। অস্যার্থ Airtel মোবাইল পরিষেবা অতি দূরধিগম্যকেও মিলিয়ে দেবে।

কিন্তু মুক্ত বাজার যে এভাবে মেলায় না তা এই দুটি শিশুর প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের খোঁজ নিলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে।'' [৮]

এমনই ব্যাক্তিত্ব অভিজিৎ সেনের। স্পষ্টভাষী, তবে কখনই নিছক কটুবক্তামাত্র নন। এবং সর্বোপরি নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কে তাঁর ধারণা একেবারেই স্বচ্ছ। লেখকের উপস্থিতি বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র পটভূমিতে বিকশিত হওয়ার দরুন তাঁর রচনার পরিসর নিঃসন্দেহে বহুবিস্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তাঁর বৌদ্ধিক অবস্থান, কখনই মতাদর্শচ্যুত হয় নি।

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, লেখকের সৃষ্টি। আমরা আগেই বলেছি লেখকের সৃষ্টির পরিসর বহুবিস্তীর্ণ। তবে এই বিস্তীর্ণতা কেবলমাত্র প্রকাশিত

গ্রন্থের সংখ্যার উপরই বিচার্য নয়। যাইহোক, আমরা এখানে লেখকের সৃষ্টির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরছি–

অভিজিৎ সেনের প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা ––

<u>উপন্যাস:</u>

১। 'রহু চণ্ডালের হাড়' - ১৯৮৫,	সুবর্নরেখা, প্রতিভাস, নান্দনিক, জে. এন চক্রবর্ত্তী এন্ড কোং।
২। 'অন্ধকারের নদী'- ১৯৮৮,	একুশে, স্বস্তিক।
৩। 'ছায়ার পাখি' - ১৯৯৩,	দে'জ, জে. এন. চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং।
৪। 'আঁধার মহিষ'- ১৯৯৩,	দে'জ পাবলিশিং, জে. এন. চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং।
৫। 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' - ১৯৯৫,	দে'জ পাবলিশিং
৬। 'হলুদ রঙের সূর্য'- ১৯৯৬,	দে'জ পাবলিশিং
৭। 'স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা'- ২০০০,	দে'জ পাবলিশিং
৮। 'মেঘের নদী'- ২০০৫,	দে'জ পাবলিশিং
৯। 'মৌসুমী সমুদ্রের উপকুল'- ২০০৬,	গাঙচিল, প্রতিভাস।
১০। 'রাজপাট ধর্মপাট'- ২০০৮,	দে'জ পাবলিশিং
১১। 'নগ্ন নির্জন হাত' - ২০০৯,	('নগ্ন নির্জন হাত', 'সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল', 'পাশ' এবং 'ক্রান্তিবলয়') - জে. এন. চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
১২। 'লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা'- ২০১১,	নান্দনিক, ঢাকা।
১৩। 'মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস'- ২০১০, (রচনা)	অগ্রন্থিত।
১৪। 'বর্গক্ষেত্র'- ২০১৩,	স্বস্তিক।

১৫। ‘নিম্নগতির নদী’- ২০০৬, দে’জ পাবলিশিং

১৬। ‘ঝড়’- ১৯৯৩, পুনশ্চ।

১৭। ‘দশটি উপন্যাস’- ২০১২, প্রতিভাস।

১৮। ‘ক্রান্তিবলয়’- ২০১৩, জে. এন. চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং।

১৯। ‘একের মধ্যে পাঁচ’- (পাঁচটি উপন্যাস একত্রে)- ২০১৪ জে. এন. চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং।

২০। ‘নক্ষত্র নদী ও নারী’ - ২০১৫, জে. এন. চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং।

২১। ‘সমসাময়িক’ - রচনা ২০১২, অগ্রন্থিত।

২২। ‘নাগকেশর অক্ষবাট’ - রচনা - ২০১৩, অগ্রন্থিত।

২৩। ‘শিরিন ও তার পরিজন’ - রচনা - ২০১৪, অগ্রন্থিত।

২৪। ‘ধর্ম ও সিংহাসন’ - রচনা - ২০১৪, অগ্রন্থিত।

২৫। ‘কার পদধ্বনি? কার?’ - রচনা - ২০১৫, অগ্রন্থিত।

২৬। ‘দিদারগঞ্জের যক্ষী’ - রচনা - ২০১৫, অগ্রন্থিত।

<u>গল্পসংকলনঃ</u>

১। ‘পঞ্চাশটি গল্প’ - ২০০০, সুবর্নরেখা।

২। ‘অভিজিৎ সেনের গল্প’ - প্রতিক্ষন, ১৯৯৬।

৩। ‘দশটি গল্প’ - পরশপাথর, ২০০৮।

৪। ‘ব্রাহ্মন্য ও অন্যান্য গল্প’ - উৎথক প্রকাশনী, ১৯৯৫।

৫। ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ - দে’জ্ পাবলিশিং, ২০০৫।

৬। ‘ঈশানী মেঘ ও অন্যান্য গল্প’ - ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট ২০০৮।

৭। ‘দেবাংশী ও অন্যান্য গল্প’ - প্রতিভাস, ২০১১।

৮। ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’ - দে’জ পাবলিশিং, ২০১৪।

৯। ‘কুড়িটি কিশোর গল্প’ - পরশ পাথর, ২০১২।

অন্যান্য

১। 'নির্জনে কুয়াশায়' - (আত্মজীবনী) - রচনা, ২০১০-২০১২. অগ্রন্থিত।

লেখকের **সাহিত্যভাবনা** আমাদের পরবর্তী অভিনিবেশের বিষয়। অভিজিৎ সেন সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যধারার গড়পড়তা চালে চলতে চান নি। এই না চাওয়া উদ্দেশ্যপ্রসূত না সময়ের চাহিদা তা যথার্থ বলা যায় না। কারণ লেখকেরই যেন এ বিষয়ে কিছুটা দ্বিধাচ্ছন্নতা রয়েছে। তিনি বলছেন–

"আমি যে খুব সচেতন ভাবেই পঞ্চাশ ষাটের ছক থেকে বেরিয়ে এসেছি (যদি এমন সত্যিই হয়), এমন মনে করি না। তবে পুরনো ফর্মুলা থেকে বেরিয়ে আসার একটা চেষ্টা তো সব সচেতন লোকের মধ্যেই থাকে।" [৯]

এই পুরনো ফর্মুলা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাম-প্রেমের চিত্রময় আখ্যান রচনার পরিবর্তে গ্রামভিত্তিক, গোষ্ঠীভিত্তিক প্রান্তিকায়িত শোষিত জনের বিশ্বাস, বেদনা, আকাঙ্খার বাস্তবিক ঘটনা বর্ণনে লেখক অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনস্তাত্বিক রোম্যান্সধর্মী আখ্যানসাহিত্য যদি 'আধুনিক' বলে বিবেচিত হয় তাহলে কি লোককথা, মিথ, দেশজ উপাদান সমৃদ্ধ সাহিত্যকে 'উত্তর আধুনিক' আখ্যায় আখ্যায়িত করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরও লেখক দেন আরেকটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে–

"সাহিত্যের গুরুত্ব কি আমি নিজেই তা ভালো করে বুঝি না। গত পঁচিশ তিরিশ বছরে পুরানো পৃথিবীর যাবতীয় ধ্যান ধারণা মূল্যবোধ এমন আগাপাশতলা পাল্টে গেছে যে মনের তাক গুলোতে কোন উপলব্ধিই আর হাতড়ে জায়গা মত পাইনা। এর নামই কি উত্তর আধুনিকতা?" [১০]

তাহলে একথা বলা যায় সমসাময়িক সময়ের ওঠাপড়াই লেখকের সাহিত্য ভাবনাকে ভাঙতে গড়তে সাহায্য করেছে। চিন্তাচেতনার বিনির্মাণই একজন সাহিত্যিকের রচনারাজিকে বৈচিত্র্যময়তা দান করে–অভিজিৎ ও এর ব্যতিক্রম নন।

অভিজিৎ সেনের অভিজ্ঞতা বিপুল। নিজেই 'উপন্যাস ভাবনা' শীর্ষক ছোট একটি লেখায় জানিয়েছেন কলকাতার দূরের গ্রাম ও ছোট শহরগুলি ও তার চারপাশের মানুষের সঙ্গে তাঁর রয়েছে নিবিড় পরিচয়, আর 'এইসব জায়গার সমাজ, সংস্কৃতি, উন্নয়ন, প্রশাসন এবং রাজনীতির মধ্যে নানা ভূমিকায় জড়িয়ে পড়ার' সুযোগ তাঁর হয়েছে। তাঁর কাছে উপন্যাস হলো সেই প্রতিবেদন যা পটধৃত মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে বুঝতে সাহায্য করে। তাই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার নানান বিষয়, চরিত্র জায়গা পায় তাঁর কথাসাহিত্যে। তিনি মনে করেন–

"নিছক কল্পনা থেকে গল্প হয় না, এমন নয়। আবার নিছক কল্পনা থেকে রচিত গল্পেও সব কিছু নিছক কল্পনা হতে পারে না। ক্ষেত্রপাল গল্পের অভিরাম ঘোষ, ছায়ার পাখি উপন্যাসের গোপাল এবং বিদ্যাধরী, দেবাংশীর সারবান লোহার, বর্গক্ষেত্রের পরশুরাম মাল, স্বপ্ন এবং উপন্যাসের আবদুল কদ্দুস, বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর উপন্যাসের বালালখিন্দর ইত্যাদি আমার তৈরি চরিত্রগুলোর ভিতরে একটু খুঁজলেই এক এক ধরণের আর্কিটাইপ বা আদিকল্প পাওয়া যাবে।

এমন নয় যে এই চরিত্রগুলো সব অবিকল বাস্তব জীবন থেকে উঠে এসেছে। ..... কিন্তু এই আর্কিটাইপ আমাদের সবার মনের মধ্যে – বহু কারণে ভ্রূণ আকারে সঞ্চিত থাকে। কিংবদন্তি, মিথ, মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদির চরিত্ররা আমাদের মনে বহু অতীত থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই আকাঙ্খা তৈরি করেছে। আধুনিক সস্তা সিনেমার চরিত্ররা সাধারণ মানুষের মনে যে বিভ্রম তৈরি করে তাও এই গোত্রের।

বিভ্রম হলেও আকাঙ্খাটা কিন্তু বাস্তব। আমার উপরোক্ত এবং আরো অনেক চরিত্র এই সব আকাঙ্খার বাস্তব এবং বাস্তবের শিল্প রূপ।..... মানুষের মনের এই আকাঙ্খার কখনো বাস্তব জীবনে পথ চলার সময় কোনো কোনো মানুষের মধ্যে তার কোনো কোনো রূপ ধরে ঝলক দিয়ে ওঠে।" [১১]

অভিজিৎ সেনের মতে, বাংলা গদ্যের ঐতিহ্যে সেই 'মালমশলা' অনুপস্থিত, যা দিয়ে আধুনিক উপন্যাস লেখা যেতে পারে। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মেদুর বাংলা উপন্যাসে আত্মরতির পৌনপুনিকতা থেকে কথাসাহিত্যকে মুক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, বিশ্বের গল্প-উপন্যাস-কবিতার বিষয় ও গীতিই হওয়া উচিত বাংলা সাহিত্যের আশ্রয়, কেননা এ পথে পদচারণা করেই আমাদের সাহিত্য 'বর্তমান বন্ধ্যাদশা' থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে স্বীকার করে ঐতিহ্য ও পরম্পরার আশ্রয়ে আখ্যানের যুগোপযোগী বিন্যাসে, কুহক বাস্তবতার শাণিত অন্তর্ঘাতে একেকেন্দ্রিকতার, একবাচনিকতার, নয়া উপনিবেশিকতাবাদী রাজনীতি ও ভাবাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য হয়ে উঠবে প্রতিবাদী আন্দোলনের এক বিশেষ ধরন– এমনই প্রত্যাশা করেন লেখক অভিজিৎ সেন। কিন্তু তথাকথিত 'আধুনিক' সাহিত্য এই পথ থেকে অনেকটাই সরে গেছে। 'কেমন যেন একটা অগভীর গতানুগতিকতা পেয়ে বসেছে' বাংলা আধুনিক সাহিত্যকে। এর কারণ কী তা লেখকের কাছে জানতে চাইলে তিনি উত্তর দেন–

"শিল্পসাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কোনোকালেই অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। তবুও পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বহু মেধাবী মানুষ শিল্পসাহিত্যের অঙ্গনে পদার্পণ করেছেন তাদের নিজেদের প্রাণের টানে প্রধানত। দ্বিতীয়ত, টাকা পয়সার সম্ভাবনা তেমন না থাকলেও গ্ল্যামার, সামাজিক সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। ষাটের দশকেও এই ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল, উপরন্তু যুগান্তর এবং আনন্দবাজার পত্রিকা সাহিত্যশিল্পকে বিশেষ করে সাহিত্যকে (মূলত ব্যবসায়ের কারণেই) প্রোমোট করা শুরু করলে বাংলাসাহিত্যে একটা বিস্তৃত পাঠক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যেমনটি সম্ভবত আগে কখনো ছিল না। কিন্তু এই বিস্তৃতি নানা কারণে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।..... ব্যবসায়িক কারণে ব্যাপক বিজ্ঞাপন দিয়ে হালকা জনরুচির সাহিত্য রচনা করার এবং তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে

চালাবার কৌশল প্রকাশকরা গ্রহণ করাতে এবং সাধারণ পাঠক তা গ্রহণ করাতে গভীর বিশ্লেষণী এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের প্রতি সাধারণতভাবে একটা অশ্রদ্ধা তথা তাচ্ছিল্য উৎসাহ পেতে থাকে। ষাট, সত্তর এবং আশির দশকে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়।

ফলে পাঠকও নেই, ক্রেতাও নেই।..... উপরন্তু একথা আমরা সবাই জানি, বিজ্ঞাপন এবং খ্যাতি বুদ্ধিমান পাঠককেও প্রভাবিত করে। সব থেকে বিস্ময়কর বিদগ্ধ পাঠক এবং সমালোচকরাও বহুল প্রচারিত পত্র পত্রিকার লেখাগুলোই পড়েন, আলোচনা করেন এবং লেখেনও সেগুলো নিয়েই।

বেশ কয়েকজন অতি বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আমার গল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রায় প্রত্যেকেই কলম খুলে আমার প্রশংসা করেছেন এবং অতি উচ্চস্থানে আমাকে বসিয়েছেন। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে এই গল্পগুলো লেখা হলেও সম্ভবত স্বল্প প্রচারিত ছোটো পত্রিকায় প্রকাশের কারণে এদের একটিও এই সমালোচকদের বেশির ভাগেরই নজরে আসেনি। এঁদের সমালোচনা পাঠ করলে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই আলোচনা লেখার আগে পর্যন্ত আমি এঁদের কাছে একেবারেই অপরিচিত ছিলাম।

ফলে বুদ্ধিমান, প্রখর অনুভূতির, সংবেদনশীল মনের মেধাবী মানুষেরা আর বাংলাসাহিত্যের পথ বিশেষ মাড়াতে চায় না। প্রচুর টাকা রোজগারের বন্দোবস্ত এদের জন্য ক্রমশঃ নতুন নতুন রাস্তা খুলে দিচ্ছে। সুতরাং গভীর বোধসম্পন্ন সাহিত্য তৈরি হবে কোত্থেকে।'' [১২]

আজকাল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যেমন তেমনি সাহিত্যেও একটা মিথ্যা সংস্কৃতিকে আমাদের সংস্কৃতি বলে চালানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই 'বানিয়ে তোলা' সংস্কৃতির নির্মাণের পেছনে শাসক শ্রেণির স্বার্থ কীভাবে জড়িয়ে আছে, এ বিষয়ে লেখকের পর্যবেক্ষণ জানতে চাইলে লেখক বলেন–

"সংস্কৃতির তত্ত্ব নিয়ে অল্প পরিসরে কোন কথাই বলা ঠিক নয়, কোনটা আমাদের সুস্থ সংস্কৃতি, কোনটা নয়, কীভাবে ঠিক হবে? এরিস্ততোল দাস ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। তিনি এই সমাজ-সংস্কৃতি শ্রেণি স্বার্থে সমর্থন করতেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা কি ভুল ছিল, মনে রাখতে হবে লোকটি ছিলেন এরিস্ততোল, যাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের জন্য মার্কসবাদী পণ্ডিতরাও কেউ কেউ মার্কসকে আধুনিক যুগের এরিস্ততোল বলেছেন। দু-চার কথা কেন দু-চার পৃষ্ঠায় এসব তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে না যাওয়াই ভালো।'' [১৩]

শ্রেণিস্বার্থের কারসাজি সংস্কৃতির 'নির্মাণে' ক্রিয়াশীল, একথা মানলেও কোনো অগভীর আলোচনায় আগ্রহী নন অভিজিৎ। এই তাঁর সিরিয়াস জীবনবোধেরই স্মারক।

দেবেশ রায়ের মতো কথাশিল্পী অভিজিৎ সেনও উপন্যাসের প্রতীচ্য আহৃত মডেল বাংলার বহুস্বরিক জীবন বাস্তবতাকে ধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রভুরা এডওয়ার্ড সাঈদ কথিত homogeniety বা সমসত্ত্বতা তত্ত্বের নামে কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী জনসমাজের সংস্কৃতির বিচিত্রতা ও বহুত্বকে প্রত্যাখ্যান করে সাহিত্যকে ভীষণভাবে একবাচনিক করে তুলেছে। ফলত পরিধিতে, বাহ্যত আনুগত্য সত্ত্বেও চেতনা ও ভাবাদর্শের জগতে, সংস্কৃতি ও পরম্পরায় যে প্রতিবাদের স্বর লালিত হয় তাকে কেবলই অস্বীকার করে চলেছে 'মূলস্রোত' সাহিত্যের আধিপত্যবাদী বয়ান। তাই সাহিত্যের, উপন্যাসের মুক্তির সন্ধানে প্রান্তিকায়িত পরিসরের লোককথা মিথ কিংবদন্তী মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেশজ আখ্যান বয়ানের যে পরম্পরা রয়েছে- তাকেই বরণ করে নেওয়ার কথা বলেন অভিজিৎ সেন –

"..... লোকজীবনের অবস্থান, লোককথা, লোকধর্ম, লোকবিশ্বাস, লৌকিক আচার, অবিচার সংস্কার ইত্যাদির অভিজ্ঞতার উপাদান যার অধিক থাকবে এবং

এসবকে যথার্থ বুঝবার ও ব্যাখ্যা করার স্পর্ধা যার থাকবে, সে আর অন্যত্র উপাদান অনুসন্ধানে যাবে কেন?

আমি লোককথার আখ্যানও উপন্যাসে নানা ভাবে বিন্যস্ত করি। আখ্যানের অংশ, আখ্যানের চরিত্র, গান, ছড়া, মঙ্গলকাব্য– তার রহস্যময় বাস্তবতা, যা আমাদের প্রাকৃত মানুষের চরিত্রকে ধরতে, বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করে, এসবও আমি উপন্যাসে এবং গল্পে আনি।'' [১৪]

কিন্তু এই 'আনা' নিছক উপস্থাপন মাত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না লেখকের রচনায়, বরং হয়ে ওঠে মিথ-লোককথা-কিংবদন্তীর এক আশ্চর্য বিনির্মাণ, এক অপরূপ নবনির্মাণ। আসলে একুশ শতকে দাড়িয়ে একটি সাহিত্যসৃষ্টিতে লোককথার ঢং অবিকল তুলে ধরলে কখনই তা পাঠকের প্রতি রচয়িতার সুবিচার হয় না। তাই এই দেশজ রীতিকে ব্যবহার করারও একটি নতুন রীতি তৈরি করে নিতে হয়। বজলুল করিম বাহার কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে লেখক অভিজিৎ বিষয়টি পরিস্কার করেন এইভাবে–

"লোককথা, লোকসঙ্গীত এবং লোকশিল্পের সেই অবাধ শৈলী আমি আত্মস্থ করতে চাই যা দিয়ে পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত সবাইকেই মুগ্ধ, বিস্মিত এবং প্লাবিত করা যায়। পুরানো ঢং এর কথা এখন আর সাধারণ পাঠক শোনে না। আর পুরোনো ঢং টাও আমাদের নিজস্ব নয়।

..... আধুনিক বাস্তবতার যতরকম রূপ আছে, তার সবকটির মধ্যেই গলাটিপে শ্বাসবন্ধ করে সুস্থ জীবনবোধকে ধ্বংস করার প্রবণতা আছে বলে অনেকের মত আমারও মনে হয়। ..... সুস্থ জীবনবোধ জাগ্রত করার জন্য মঙ্গলকাব্যের বাস্তবতা কিংবা লোককথার বাস্তবতাকে নতুন যুগোপযোগী করে নিয়ে আসাতেই আমার এবং আমার মত আরো অনেকেরই লক্ষ্য থাকবে।'' [১৫]

লোককথা/মিথ ইত্যাদির পুনঃসৃজন সম্পর্কে লেখক বিভিন্নত্র এই যে কথাগুলো

বলেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি সচেতনভাবে পোস্টকলোনিয়াল সাহিত্য আন্দোলনের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত। এই ধারণা কতটা ঠিক, প্রশ্ন করলে লেখক জানান –

"আমি অ্যাকাডেমিক জগতের কথাসাহিত্যিক নই। ভারতবর্ষে যখন প্রায় দুশো বছর ধরে ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল, সেই প্রভাব তো এখানকার লেখকদের লেখায় পড়বেই। সেই উষ্মাত্ত থাকবে।'' [১৬]

আর তারজন্যেই হয়তো ম্যাজিক রিয়ালিজম হয়ে ওঠে তার সাহিত্য সৃষ্টির একটি বড় উপাদান। লাতিন আমেরিকার সাহিত্য জগতে উদ্ভূত এই ম্যাজিক রিয়ালিজম এর বিপুল ব্যবহার অভিজিৎ সেনের সাহিত্য শৈলীর একটি বিশেষ দিক। মার্কেজের প্রভাব -এর মধ্যে সর্বাধিক। কারণ সম্ভবত উভয়েই ঔপনিবেশিক সময়ের দ্বারা আক্রান্ত, শোষিত, অভিজ্ঞ। সরাসরি বিরোধের স্থান, ক্ষমতা এবং অভিপ্রায় না থাকার দরুনই সম্ভবত এই জাদুবাস্তবকতাকে আশ্রয়। এখন প্রশ্ন হলো বাস্তবতা ও ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার তফাৎ কোথায়–এ সম্পর্কে লেখক জনপদপ্রয়াস পত্রিকায় প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকারে জানান,

"সাপের কামড়ে ওঝার শরণাপন্ন হওয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রির গলায় সাপ এবং মুখে মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ন- মারণ-বশীকরণ-ডাইনি-যাদু-টোনা- দৈব মাদুলি- আংটি- পাথর এসব শুধু লোকায়ত বিশ্বাস নয় বোধহয়। উচ্চতর শিক্ষিত বিদ্বজ্জনের সমাজও তো এসব বিশ্বাস বা আবেগ থেকে মুক্ত নয়। বরং আমার তো এক এক সময় বলতে ইচ্ছা হয় যে মন্ত্রতন্ত্র, ওঝালি, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, ভুতপ্রেত, পরি– এসব আমাদের 'সত্যি সত্যিই' আছে। আছে মানে আরও পরিস্কার করে আমি বলতে চাই, হ্যাঁ 'লখিন্দর ফিরে আসে', নদী বেয়ে আসা বাসি মরাকে সত্যিই সাধু 'জিয়ায়'। বালা কালমাশনার কোপে হরিণার দহের ঘুর্ণিপাকে পড়লে কবিরাজ গুণমান মন্ত্রপড়া ধুলো ছুড়ে তাকে উদ্ধার করে।

লোকায়ত মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রায় পুরোটাই ধর্মকে আশ্রয় করে। এই 'ধর্ম' শব্দটাকে যতদূর সম্ভব আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে চাই। উচ্চকোটির সামাজিক মানুষের কাছে ধর্ম এভাবে পরিপূর্ণ আশ্রয় কখনোই হয়ে ওঠে না। প্রয়োজন হয় না। তবুও একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন লোকায়ত মানুষ অপেক্ষা এই উচ্চকোটির মানুষেরাই কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসে বেশি আচ্ছন্ন হয়। আমার অভিজ্ঞতায় ক্ষেতে কাজ করা এবং কলকারখানা দিন মজুরিতে নিযুক্ত ব্যাপক মানুষের হাতে, গলায়, বাজুতে, কোমরে কুসংস্কার জাতীয় কোন শিকড়, গাছড়া, ধাতু, গ্রহশান্তি, পাথর, কবচ, তাবিজ, সুতোর গোছা এসব খুব কমই দেখতে পাওয়া যাবে। জাতপাতের বাছবিচার বিদ্বেষ, ঘৃণা, রেষারেষিও খুবই কম এইসব সাধারণ মানুষের মধ্যে। অন্যদিকে, সমাজের উচ্চকোটির মানুষেরা, বিশেষ করে পেশাদাররা, হোক সে রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড়, ব্যবসায়ী, সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদি শো বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত অনেক মানুষ ব্যাপক মধ্যশ্রেণির সর্বদা সুরক্ষার অভাব বোধকরা আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ, এদের মধ্যে কুসংস্কারের প্রভাব অনেক বেশি। এসব আমার বামপন্থী তত্ত্ব আহৃত কাণ্ডজ্ঞান নয়, নিজস্ব অভিজ্ঞতারই ফসল।.....

যুক্তিবাদীরা হাজার চোখে আঙুল দেওয়া বক্তৃতা সত্ত্বেও ধর্মশাস্ত্রের দৃঢ়প্রাচীর চুরমার করা, বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কার সত্ত্বেও ধর্ম এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তেমন জোরদার কোন আঘাত সম্ভব নয়। নিষ্ঠুর পৃথিবীর হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাওয়ার চেষ্টায় লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের কাঁদার জায়গা হিসাবে এসব থাকবে। সময় সময় দিশেহারা ব্যক্তিমানুষ ডাইনি নিধন কিংবা বালক বলির মতো নৃশংস ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে। এর জন্য দোষী যদি কাউকে করতেই হয়, তা হলে সমাজব্যবস্থাকেই করতে হয়।'' [১৭]

আসলে এই ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতা ব্যাপারটা লেখকের রচনায় কোন আরোপিত বিষয় হিসেবে আসে নি। আমরা যে সমাজ বাস্তবতায় বাস করছি

(টিভি সিরিয়াল বা তথাকথিত মেইনস্ট্রিম আধুনিক কথাসাহিত্যে উঠে আসা বানিয়ে তোলা সমাজবাস্তব নয়, সাধারণ মানুষের প্রকৃত সমাজ বাস্তব), সেখানে বাস্তবের সাথে জাদুর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আসলে আমাদের সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যবাদের শাসনে অভ্যস্ত সমাজে মার্কসবাদের অনুসরণে বলতে পেলে ভিত্তি হলো অর্থনীতি, আর এর উপরিসৌধ হিসেবে সর্বাধিক সক্রিয়ভাবে যে বিষয়টি কাজ করছে তা হলো 'ধর্ম'। এই ধর্মেরই নানান রূপের মধ্যে রয়েছে কুসংস্কার, জাদু টোনা, দৈবমাদুলি, ঝারণ-মারণ, বশীকরণ, মন্ত্রতন্ত্র ডাইনি বিশ্বাস ইত্যাদি। যার মধ্যে আংটি, গ্রহরত্ন, গুরুদেবের পরামর্শ অনুযায়ী নাম পরিবর্তন– এইসব তথাকথিত রুচিসম্পন্ন কুসংস্কার গুলি অর্থনৈতিক ক্ষমতাপন্ন এবং বাকি নিচুস্তরের কুসংস্কারগুলি প্রান্তিক জনগণের কৃপায় বহাল তবিয়তে সাড়ম্বরপূর্ণভাবে বিরাজ করছে আমাদের একুশ শতকের ভারতীয় সমাজব্যবস্থায়। মার্কসবাদ এই বিষয়টিকে গোড়া থেকে ধরবার চেষ্টা করেছিল তার তত্ত্ববীক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু, সময়ের কালক্ষেপে নানা সংযুক্তি ও বিযুক্তি করণের প্রক্রিয়ায় বর্তমানে তা তার মূল কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেছে অনেকটাই। মার্কসীয় বীক্ষার উৎসের যে মূল তত্ত্বপ্রস্থান তার সাথে মরমের সঙ্গে যুক্ত লেখক অভিজিৎ সেন নিজেকে বর্তমানে যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেও ধর্মের ব্যাখ্যায় সেই অন্তরের যোগস্থানটিকেই আরেকবার উন্মেচিত করেন–

"মার্কসবাদ আজকাল খুব হাসিঠাট্টার ব্যাপার হয়ে গেছে। মার্কসবাদের তত্ত্ব যে 'বস্তাপচা' তা সংবাদপত্রের কিংবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যে কোনো সংবাদদাতাও জানে। ধর্ম যে আফিম, মার্কসের এই কথাটা কত বামপন্থীকে যে কোনঠাসা করেছে এবং এখনো করছে তার আর শেষ নেই।

আসলে এই তত্ত্বটার মধ্যে কোন গোলমাল নেই। যে মানুষ মাদক গ্রহণ করে সে বড় অসহায় মানুষ। ধর্ম যে এক ধরণের মাদক, মানুষকে যে তা আচ্ছন্ন করে রাখে,

তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে কারো?

ধর্মীয় আচার আচরণ এবং কুসংস্কারের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? দক্ষিণেশ্বরের কুমারীপুজো এবং ওড়িষ্যার দেবী কলাপটের সামনে বালক বলি দেবার মধ্যে?'' [১৮]

বামপন্থী রাজনীতির সাথে লেখকের এককালে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল একথা লেখক নানা স্থানে স্বীকার করেছেন। যদিও পরবর্তীতে বামদলের বহুধাবিভক্ত পরিসরের বিস্তৃত শাখা প্রশাখায় লেখক আর নিজেকে না জড়িয়ে সাহিত্য চর্চায়ই মনোযোগী হবার সংকল্প নেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট এর সাড়ে তিন দশকের শাসনের ভূমিসংস্কার, গ্রামীন কৃষকের ক্ষমতায়ন, নারী আন্দোলন, সমবায় আন্দোলন, নারী সবলীকরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানে তৈরি হওয়া 'Development Narrative' সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পেরেছিল বা পারে নি– ইত্যাদি বিষয় নানাভাবে ছুঁয়ে আছে লেখকের কথার ভূবনকে। পাশাপাশি এই বামরাজনীতির মধ্যের নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্লেশ ইত্যাদিও তার রচনায় বস্তু স্থানে টুকরো টুকরোভাবে স্থান পেয়েছে। জনপদপ্রয়াস পত্রিকার তরফে সেনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল–

"আপনি মানুষ হিসাবে বামরাজনীতির সমর্থক– কিন্তু বামরাজনীতি আজ নানা স্তরে বিভ্রমে বিভঙ্গে বিরাজমান– আমজনতার দিক থেকে এ ধরণের মুখর রাজনীতি মনস্কতা কতটা দিশাসম্ভব- সমাজ বাস্তবতায় এ ধরণের রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছে কী ধরণের অস্মিতা তুলে ধরেছে–'' [১৯]

লেখক তার উত্তরে বামরাজনীতি সম্পর্কে চিন্তা-চেতনা তুলে ধরেন এভাবে –

"আমার বাম-রাজনীতির সমর্থনের প্রকৃতি একেবারেই সাধারণ। সাধারণ মানুষের পক্ষে নানা 'বিভ্রমে- বিভঙ্গে' আক্রান্ত মতবাদ যুক্ত বামপন্থীদের উপরে আস্থা রাখার খুব একটা মানে সত্যিই নেই। এ শুধু যে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সত্য তাই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই মুহূর্তে ব্যাপারটা এরকমই। অন্যপন্থায় তো

বটেই, বামপন্থার রাজনীতিবিদদেরও নানা কারণে সন্দেহ হয়। সরকারে যাওয়ার আগে তবু একরকম, সরকারে যাওয়ার পরে সমর্থন বহুসময়েতেই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকার যেমন একটা সুবিধা আছে, আবার আরেক দিকে অসুবিধাও আছে। পার্টিজান নয় এমন একজন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি অবশ্যই কোনো না কোনো সময়ে নৈরাজ্যবাদী।

আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয় কেন কম্যুনিস্টপার্টিগুলোর কাছে দাবি করা হয় যে তারা সংখ্যালঘু প্রধান অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী দেবেন না। কেন শিল্পায়ণ, নগরায়ন ইত্যাদি বৃহৎ কর্মকাণ্ডে বিদেশি পুঁজিপতিদের আহ্বান করবে না। কেন এ দেশে তারা পুঁজিবাদী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করবে না। এই রকম আরো অনেক প্রশ্ন।

অচিরেই বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্র এনে দেবার স্বপ্ন এখন আর এদেশে কেউ দেখায় না। সম্ভবত, নানা নীতি ও শৃঙ্খলায় বিভক্ত নকশালপন্থীরাও না। কোনো সাধারণ মানুষ এখন তা দেখেও না।

তবুও সারা দেশব্যাপী বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে বামপন্থীদের এখনো তুলনামূলকভাবে মহত্তর মানুষ বলে মনে হয়। মনে হয় আর্দশের ছিটেফোটা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকার মানসিকতা খানিকটা এখনো তাদেরই আছে।

তবে এটুকুও আর কতকাল থাকবে তা অবশ্য ভাববার বিষয়।'' [২০]

লেখক আরও বলেন,

"বিগত ত্রিশ-বত্রিশ বছর যাবত আমার অবস্থান প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বেশ দূরেই। কোনো দলের সঙ্গে কোনোভাবেই এমনকি, গণসংগঠনের মাধ্যমেও নিজেকে আর যুক্ত করিনি।

আমি সত্তরের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত যে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, সেখান থেকে সরে আসার আগেই আমার মোহভঙ্গ হয়েছিল। 'স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা' এবং

'হলুদ রঙের সূর্য' এই দুই উপন্যাসে নকশালপন্থা সম্পর্কে আমার মনোভাবও আমি অকপটে বিবৃত করেছি। নকশালপন্থী একটিভিস্টদের আমি অন্য বামপন্থী দলের কর্মীদের থেকে বেশি সাহসী, ত্যাগী, নির্লোভ এবং আদর্শবাদী মনে করিনা।

অধিকন্তু নকশালপন্থীদের আমি অন্য দলের কর্মীদের অপেক্ষা অনেক বেশি অসহিষ্ণু এবং পরমতবিদ্বেষী বলে মনে করি। এই কারণেই তাদের এত উপদল এবং এত গোষ্ঠী। মত ও পথের ঐক্য না হলে অস্ত্রের সাহায্যে নিষ্পত্তিকে আমার এক ধরনের মৌলবাদই মনে হয় এখন। সেই সূত্রে জনযুদ্ধ, মাওবাদী, এল.টি.টি কিংবা লাতিন আমেরিকার গেরিলাদের সঙ্গে মুসলিম উগ্রপন্থীদের কোনো পার্থক্য করা যায় না। আমার মনে হয় আধুনিক পৃথিবীতে গণতন্ত্রের ভিত্তি বিগত শতাব্দী থেকে অনেক শক্তিশালী হয়েছে। আর্জেন্টিনা কিংবা ইন্দোনেশিয়ার নিকট অতীতের অভ্যুত্থানগুলোর কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের তিরিশ বছরের বামপন্থী শাসন রাজনৈতিক বিচারে একেবারে হেলাফেলার বস্তু নয়। একেবারে হালের ভেনেজুয়েলার অভিজ্ঞতা পৃথিবীর পরিবর্তনকামী মানুষের কাছে নতুন আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।'' [২১]

'মেইনস্ট্রিম লিটারেচার' আর 'বিকল্প সাহিত্যধারা' এই রকম বিভাজন আজকাল সাহিত্যের আলোচনায় প্রায়শই শোনা যায়। শহুরে জীবনের প্রেক্ষাপটে নর-নারীর কাম-প্রেমের গল্পই যেন মূলধারা সাহিত্যের একমাত্র আধেয়, আর অন্যদিকে বিকল্প ধারায় কেন্দ্রীয় উপাদেয়ই হলো 'গ্রাম'। অর্থাৎ সত্তরের দশকের ব্যতিক্রমী লেখক গোষ্ঠীর মূলধারা থেকে সরে আসার মূলপথই ছিল গাঁয়ের মেঠোপথ। এর অর্থ কী গ্রামীণ জীবন এর পূর্ববর্তীকালে বাংলা আখ্যানে উপেক্ষিত? লেখক বলেন –

"একথা ঠিক নয়। বরং উল্টোটাই অনেককাল পর্যন্ত ঠিক ছিল। স্বাধীনতার পরে শহর জীবন ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে।'' [২২]

সাধারণ গ্রামীণ জীবনই ছিল প্রাক্ উপনিবেশিক পর্বের আখ্যান সাহিত্যের

মধ্যমণি। ভূমিসংলগ্ন মানুষই ছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রধান কুশীলব। সেখানে উপনিবেশিক পর্বের আখ্যান সাহিত্য থেকে প্রান্তবাসী সাধারণ মানুষ চিরতরে বিদায় নিল। এমনই একটি প্রেক্ষাপটে আত্মপ্রকাশ করলেন মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন প্রমুখ লেখকেরা যারা ঔপনিবেশিকতা প্রদত্ত আধুনিকতার বিপরীতে এক নতুন আধুনিকতার কথা বললেন। এই নতুন আধুনিকতায় সাহিত্য নির্মিত হবে colonizer দের মতানুযায়ী নয় বরং colonized দের কেন্দ্রে রেখে তাই তারা যান প্রান্তিকায়িতের পরিসরে, আদিবাসী, গ্রামীণ মানুষের অন্দরে। কেননা তারা মনে করেন ভারতবর্ষের মত বৃহৎ গ্রামে বসবাস করে গ্রামজীবনের কথা না লিখতে পারলে প্রকৃত লেখক হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। সত্তরের দশকের তাই অধিকাংশ লেখকদের রচনায়ই শুনতে পাওয়া যায় 'গ্রামে চলো' সুর। অভিজিৎও এর ব্যতিক্রম নন। গ্রাম-জীবন, গ্রামীণ সমাজ, গ্রামের রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্তই নানাভাবে নানাস্থানে উঠে এসেছে লেখকের রচনায়। লেখকের রচনায় গ্রামজীবনের এমন উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ দাপট কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লেখক জানান–

"কলকাতাকেন্দ্রিক মানুষ হয়েও লেখালেখিতে কেন গ্রামকেই প্রধান স্থান দিয়েছি, প্রশ্ন ওঠার আগে, সচেতনভাবে কখনোই তা ভাবি নি। আমার লেখা প্রসঙ্গে আলোচনাতে গ্রামের কথাই বেশি ওঠাতে আমিও খুঁজতে শুরু করি এর কারণ।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে যখন প্রথম কলকাতায় আসি, আমি তখন খুবই ছোট। বছর আট নয় বয়স হবে। আমাদের জেলায় (বরিশাল) কোথাও কোথাও তার আগে থেকেই দাঙ্গা হচ্ছিল। গুজব এবং আতঙ্ক আমাদের বয়সী শিশুদেরও আচ্ছন্ন করে রাখত, সে কথা এখনো মনে আছে আমাদের পুরানো বাড়িটার দোতালার ছাদে ইটভাঙ্গা, ভাঙ্গা কাঁচের বোতল ইত্যাদি জড়ো করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গাবাজদের একটি দল যেদিন ধ্বনি দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে নিচের উঠানে এসে থেমেছিল, সেদিন ইটের টুকরোর মত প্রস্তর যুগীয় অস্ত্রও আমাদের অভিভাবকেরা ব্যবহার করত পারেন নি। আমার শিশু

বয়সের এই অভিজ্ঞতার কথা 'সীমান্ত' গল্পে বিস্তারিতভাবে লিখেছি। আমার নিজের একজন এবং জেঠতুতো তিনজন দিদি তখন বড় হয়েছে। এই চারজন যুবতীর জন্য তখন সমস্ত পরিবারের সোচ্চার দুশ্চিন্তা। এখন ভাবতে কেমন যেন লাগে যে, এই চারজনই এখন তাদের বার্ধক্যে অথবা প্রায় বার্ধক্যে।

তখন নিঃশব্দে এবং গোপনে গ্রামবাসী অন্যান্য হিন্দু পরিবার সীমান্তের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল। পাশের বাড়ির লোকেরাও অনেক সময় জানতে পারে নি যে শ'য়ে শ'য়ে বছর ধরে যারা প্রতিবেশি এবং আত্মীয়, পরদিন ভোরে উঠে তাদের ভিটে শূন্য দেখবে। দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই আমি এরকম ভয়ংকর ঘটনার কারণ খুঁজতে শুরু করেছিলাম। আমরা যেদিন চলে আসি, সেদিনটার কথাও আমার মনে আছে। মা-বাবা এবং জেঠামশাই-জেঠিমা আমার থেকেও বয়সে যারা ছোট, তাদের নিয়ে দেশেই থেকে গিয়েছিলেন। আমরা বারো তেরোজন কলকাতার পথে রওয়ানা হয়েছিলাম। বৈঠকখানার ঘরটা পেরোবার আগে পর্যন্ত কলকাতা যাওয়ার উত্তেজনায় অন্য কিছু খেয়াল হয় নি। ঘরটা আধাআধি পেরোবার পর টের পেয়েছিলাম যে আর হাঁটতে পারছি না। নিমেষে চোখ ভর্তি হ'য়ে জল উপচে পড়ল গাল বেয়ে। আমরা কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছিলাম না, শব্দ করে কাঁদছিলামও না কেউ। আমি জানতাম আমার আর পিছন ফিরে তাকাবার উপায় নেই, আমার বা অন্য কারো। প্রথম তিন সন্তানকে ছেড়ে আমার মা এবং প্রথম চার সন্তানকে ছেড়ে আমার জেঠিমা পুরানো বাড়িটার কোন কোটরে যে কবাট বন্ধ করে পড়েছিলেন, তা আর কেউ টের পায়নি। অবশ্য এই ঘটনার তের-চোদ্দ বছর পরে আমাদের সঙ্গে আমাদের মায়ের এবং প্রায় কুড়ি বছর পরে জেঠিমার সঙ্গে তার সন্তানদের ফের দেখা হয়।

একজন পিসিমা ছিলেন আমাদের (আসলে তিনি আমাদের বাবাদের পিসিমা এবং তাবৎ অঞ্চলের 'পিসি ঠারইন')। একখানা ঘর ভর্তি ছিল তাঁর ঠাকুর-দেবতার আসনে। তাঁর ছিল অনেক রকমের পূজা ও ব্রত। এইসব পূজা, ব্রত এবং সম্পর্কিত

নানাধরনের আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই তাঁর জীবন। গ্রামের ব্রতচারিণী মহিলাদের তিনিই ছিলেন প্রধান। আমার শৈশবেরই তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গিয়েছিল। সমস্ত ব্রত এবং পূজার অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম তাঁর সঙ্গী। আমার মনে আছে, অঘ্রান কিংবা পৌষ মাসের শেষ রাতে কি একটা ব্রত উদযাপন করতে যেন তাঁরা যেতেন ধানের ক্ষেতে। আমি সেই বর্ষিয়সী মহিলাদের এখনো যেন দেখতে পাই। কুয়াশা এবং হিমের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে তাঁদের আঁচল ধানের লুটিয়ে পড়া গুচ্ছের উপরে। কুলার উপরে সরা দিয়ে ঢাকা সন্তর্পন-প্রদীপ, তাঁরা কোন গুহ্য অভিসারে ফসলের, বংশের এবং পালিত পশুদের শ্রীবৃদ্ধি আদায় করছেন প্রাচীন যাদুকরীর ভঙ্গিতে, 'ধন-জন-পরমাইয়ের' অঙ্গীকার দাবী করছেন কাকে যেন কিভাবে খুশি করে।

এইসব স্মৃতি নিয়ে কলকাতায় আসা। সে যেন এক শত্রুপুরী। মহানগরী তার যাবতীয় হিংস্রতা এবং নির্লিপ্ততা নিয়ে জেগে উঠল আমার চারপাশে।

আমার ফেলে আসা গ্রাম এবং সেখানে পড়ে থাকা মা-বাপের জন্য এক প্রবল বিষন্নতা বোধ সেই বয়সেই আমাকে ভীষণ একা করে ফেলেছিল। গ্রামে ফিরে যাবার জন্য, মা-বাবার কাছে ফিরে যাবার জন্য কি পরিমাণে যে আকাঙ্খা করতাম, সে চিন্তা আজও কষ্ট দেয়। কিন্তু সেসব আর হয়নি। শেষে এক সময় নিজেই টের পাই কলকাতার মজা, কলকাতার নেশা। আস্তে আস্তে আন্দোলনের অংশীদার হওয়াতে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আমার অবশ্যই হয়েছিল। আন্দোলনের অগ্রগতি, বিপর্যয় এবং পরাজয়ের স্তরগুলোতে অন্য সবার মত আমারও উপলব্ধির পরিবর্তন হয়েছে। সত্তর দশকের আন্দোলনে বিপর্যয়, পরাজয় এবং পর্বতপ্রমাণ ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও যে পরিবর্তনের চিহ্ন রেখে গেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা বিরল। এই আন্দোলন চলাকালীন যথার্থভাবে গ্রামের অন্তরাত্মার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। প্রায় চারবছর গ্রামজীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত

থেকেছি। এক নাগাড়ে যে থাকতে পেরেছি এমন দাবি করি না। কিন্তু পরিণত বয়সের বুদ্ধিতে গ্রাম সম্পর্কে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এই সময় থেকেই শুরু। গ্রামে থেকেছি, নিরূপায় হয়ে পালিয়ে এসেছি কখনো, আবার গেছি।

পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরে আমার বসবাস ইংরাজি একাত্তর সাল থেকে। তিয়াত্তর-চুয়াত্তর সাল থেকে একটি সমবায় ব্যাংকের চাকরি এবং ছিয়াত্তর সাল থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের চাকরির সূত্রে পশ্চিম দিনাজপুরের কয়েকশো গ্রাম আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, ঘুরেছি, গ্রামের মানুষের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছি, রাত্রিবাস করেছি এবং ক্যাম্প করেও থেকেছি। গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে এমন ওতোপ্রোতভাবে মেলামেশা আমার রাজনৈতিক জীবনেও সম্ভব হয়নি। এইসব গ্রামের মানুষ শ্রেণিবিশেষে আমার বন্ধু হয়েছে, শত্রু হয়েছে। ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও পড়তে হয়েছে দু'একবার। এইসব অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি নিয়েই আমার লেখালেখি।

এই সংক্ষিপ্ত হিসেবে আমি নিজেই আবিষ্কার করি যদিও সারাজীবনের কাজকর্মের কেন্দ্রে কলকাতাই, তবুও জীবনের বেশিরভাগ সময়ই আমার কেটেছে গ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মফস্বল শহরে। কাজেই যাকে আপনারা "বাস্তবতা'' বা "বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছেন, তা যদি সত্যিই আমার লেখায় কিছু থাকে, সারাজীবন ধরেই সেসবের সঙ্গে আমার পরিচয়।'' [২৩]

গ্রামের কথা বলতে গিয়ে জমি, কৃষক, পঞ্চায়েত, গ্রামের সাধারণ মানুষ, কৃষকদের উপর শোষণ, বর্গাব্যবস্থা, জমিভাগ, আধিচাষ– ইতাদি নানান বিষয় লেখকের রচনায় খুব স্বাভাবিকভাবেই জায়গা করে নেয়। লেখকের ভাষায়–

"আমার লেখার বেশি অংশই আমাদের গ্রামাঞ্চল অথবা মফস্বল শহরের মানুষকে নিয়ে। আমার চরিত্ররা প্রায় সবাইই জমি আশ্রয়ী মানুষ। আর এই জমি আশ্রয়ী মানুষকে শাসন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের পরিসেবা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত কিছু

মানুষ। অনেক বছর জড়িত ছিলাম বলে জমির ব্যাপারটা কিছুটা বুঝি। জমি শাসন, জমির শোষণ, জমির বিভিন্ন স্বত্ব, কৃষি আশ্রয়ী মানুষের যাবতীয় বোধবিশ্বাস, আবেগ, অনুভূতি, আপস লড়াই, ইতিহাস,-কিংবদন্তী এইসব ব্যাপারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা আমার অন্তত একশোটি গল্প উপন্যাসে আছে।'' [২৪]

আর এই রচনাগুলিতে কীভাবে কৃষকদের উপবাসের মূল্যে জমিদার জায়গিরদাররা স্ফীতকার হয়েছে, আধিপত্যবাদীরা একাধিপত্ব হাসিল করেছে, সামন্ততন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে শাসন অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছে– এসব নানা বিষয় অত্যন্ত বাস্তব প্রেক্ষিতরূপে হাজির হয়েছে লেখকের কথনবিশ্বে।

গ্রামজীবন, প্রান্তিকায়িতের সুর, প্রত্নকথা, মিথের বিনির্মাণ, ঔপনিবেশিকতা থেকে সাহিত্যকে মুক্তিদানের প্রচেষ্টা, এসব বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি লেখকের রচনায় আরেকটি বিষয়ের উপস্থিতি বেশ জোরালো রূপে প্রতিভাত হয়েছে,– সেই বিষয়টি হলো যৌনতা। যৌনতা, যৌনদৃশ্যের বর্ণনা এগুলিতে লেখক ইংগিতে নন, বিবরণে বিশ্বাসী। অথচ বিবরণের মধ্যে এমন এক ধরণের ভাষিক সংযম থাকে যে দীর্ঘ বর্ণনা সত্বেও তা পর্ণগ্রাফির স্তরে পৌঁছায় না, এও লেখকের একটা রচনাকৌশল। এ বিষয়ে লেখকের অভিমত জানতে চেয়ে আমরা লেখককে প্রশ্ন করেছিলাম–

* আপনার গল্প উপন্যাসে যৌনতার নন্দন অনেকটা জায়গা পেয়েছে অথচ এগুলো সাদামাটা রগরগে মুহূর্ত সৃজন মাত্র নয়, প্রতীকাদির ব্যবহার থেকে মনে হয় নির্দিষ্ট অভিপ্রায়বশতই আপনি যৌনতাকে ব্যবহার করেন। এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন–

অভিজিৎ সেন ঃ– *"Sex বা যাকে বাংলায় বলা হয় যৌনতা এবং violence বা হিংস্রতা (যা ক্রোধের পরিণতি), এই দুই প্রধান রিপুর প্রভাবে মানুষকে যেমনভাবে চেনা যায়, তেমন বোধহয় অন্য কোনো রিপুর বেলায় হয় না। তোমার দেওয়া 'যৌনতার নন্দন' কথাটা আমার পছন্দ হয়েছে। বহু লেখক লেখায় স্থূল যৌনতা নিয়ে*

খোলাখুলি লেখেন। ফরাসী সাহিত্যে এ ব্যাপারটা বহু আগে থেকেই দেখা গেছে। আধুনিকদের মধ্যে লাতিন আমেরিকার অসাধারণ কথাসাহিত্যিক গা. গা. মার্কেজের লেখাতে এই স্থূলত্ব ভুরিভুরি দেখা যায়। আমি যৌনতাকে নান্দনিকভাবে উপভোগের পক্ষপাতী। সব নারী পুরুষ শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই পরস্পরকে দেখে না, শুধু মুগ্ধ হওয়ায় জন্যও দেখে। কেউ হয়ত বলবে, এ সবের উৎস তো ওই আদিম প্রবৃত্তিটি। অবশ্যই, তবে শৃঙ্গার রসের প্রকাশ হিন্দি সিনেমায় যেমন হয় সেটা আমার পছন্দ নয়, ভারতনাট্যমে বা ভারতীয় যে কোনো ধ্রূপদী নাট্যে যেমনভাবে প্রকাশিত হয়, সেটাই পছন্দ।'' [২৫]

এরকম আরও বিভিন্ন বিষয় যেমন রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, ইত্যাদিও কমবেশি স্থান পেয়েছে লেখকের রচনায়। লেখক দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য রচনার সাথে যুক্ত আছেন। এখনও প্রতিবছর পূজাসংখ্যা, মাসিক পত্র, ছোট কাগজ ইত্যাদিতে লেখকের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন Social Networking Site- এ লেখকের যে টুকরো টুকরো মন্তব্যগুলো বেরোয় এতে লেখকের সাহিত্য ও সমাজ ভাবনার টুকরো টুকরো ছবিই যেন আমরা দেখতে পাই। সময়ের সাথে সাথে পরিণত হয়েছে লেখকের চিন্তাভাবনা, গভীর হয়েছে তাঁর লেখনকলা, নিবিড় হয়েছেন তিনি সাহিত্যের সাথে আর পাঠক পেয়েছে একজন আশ্চর্য লেখনক্ষমতা সম্পন্ন লেখককে যার রচনারাজি যতই উচ্চস্তরের শৈল্পিক গুণ সম্পন্ন হোক না কেন, এর রচয়িতা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মতই একেবারে সাদামাটা। আমরা আমাদের গবেষণার স্বার্থে লেখককে লিখিতভাবে যে সব প্রশ্ন করেছিলাম এতে লেখক যে উত্তরগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং জনপ্রদপ্রয়াস পত্রিকা, অঞ্জন সেন, বজলুল করিম বাহার প্রমুখের সাথে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লেখকের উক্তিসমূহ আমাদেরকে এই অধ্যায়টির পরিবেশনায় এবং

আমাদের লেখক অভিজিৎ সেনকে কাছ থেকে জানতে ভীষণভাবে সহায়তা করেছে। লেখককে করা আমাদের প্রেরিত প্রশ্নমালার শেষ প্রশ্নে লেখকের অভিব্যক্তিটি যথাযথরূপে উপস্থাপন করে আমরা আমাদের এই অধ্যায়টির সমাপ্তি টানার প্রচেষ্টা করছি–

* দীর্ঘকাল লেখালেখির পর বর্তমান পর্যায়ে এসে কোথাও কি কোন অপূর্ণতার অনুভব রয়েছে? কোন কথাটি 'এখনও হয়নি লেখা' বলে আপনার মনে হয়?

অভিজিৎ সেন ঃ– *"যে কোন সৃজনশীল মানুষের কাছে অপূর্ণতা সদা জাগরুক। লেখক তো স্বাধীন নয়, আমার মতো লেখক। অপূর্ণতাকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করার মতো সাহসী মানুষ আর কজন থাকে। বয়স হয়েছে, আর হয়তো খুব কম দিনই লিখতে পারব। নিজেই বুঝি যে এমন প্রতিভাধর কিংবা প্রজ্ঞাবান লেখক আমি নই যে, যুগান্তকারী কিছু লিখে ফেলব। আর লেখালেখির জগতের যে অবস্থা, তাতে কে আর তেমন ভরসা করে? লেখক হিসেবে আমার আকাঙ্খা একটাই, তা হল, শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান মানুষ যদি ঘটনাচক্রে আমার কোনো লেখা পড়েও ফেলে, আমাকে যেন নির্বোধ, অশিক্ষিত এবং ওপর চালাক বলে না ভাবেন। লেখাতে আমি আগাগোড়া সেই চেষ্টাই করেছি।"* [২৬]

লেখকের সাহিত্যভাবনার নানা দিক আমরা উপরে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। বস্তুত এই ভাবনার অবিকল প্রতিফলন আমরা লক্ষ করব অভিজিতের রচনার বিষয়বোধে, এবং অন্তর্বয়নে নিজস্ব বিশ্লেষণ বক্তব্য ও সমালোচনার স্থাপনায়। লেখকের সাহিত্যবীক্ষার আলোকেই আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তাঁর নির্বাচিত উপন্যাসগুলির নিবিড় আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

*****

উল্লেখসূত্র –

১। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বস্তুত অভিজিৎ বেশিরভাগ উত্তর লিখিতভাবেই দিয়েছেন। আমরা লিখিত অংশই উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যেই রাখছি।

২। ঐ

৩। ঐ

৪। অঞ্জন সেনের সাথে লেখক অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, ক্রোড়পত্র, নিসর্গ, ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় ''বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা কেউ কেউ সত্যিই একটা বিকল্প ধরণ খুঁজছি'' শীর্ষক অংশে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা– ১৬৫।

৫। বিকাশ শীল সম্পাদিত, জনপদপ্রয়াস, বইমেলা জানুয়ারি, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা– ২৩।

৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩, ২৪।

৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৫।

৮। ঐ, পৃষ্ঠা - ১৭।

৯। অঞ্জন সেনের সাথে লেখক অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, ক্রোড়পত্র, নিসর্গ, ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় ''বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা কেউ কেউ সত্যিই একটা বিকল্প ধরণ খুঁজছি'' শীর্ষক অংশে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা– ১৬৫।

১০। বিকাশ শীল সম্পাদিত, জনপদপ্রয়াস, বইমেলা জানুয়ারি, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা- ২৬।

১১। ঐ, পৃষ্ঠা– ৮, ৯।

১২। ঐ, পৃষ্ঠা– ২৩, ১৪।

১৩। অঞ্জন সেনের সাথে লেখক অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, ক্রোড়পত্র, নিসর্গ, ৯ম বর্ষ ১ম

সংখ্যায় ‘‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা কেউ কেউ সত্যিই একটা বিকল্প ধরণ খুঁজছি” শীর্ষক অংশে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা– ১৬৫।

১৪। ঐ , পৃষ্ঠা– ১৬৫।

১৫। বজলুল করিম বাহার- এর মুখেমুখি অভিজিৎ সেন, ক্রোড়পত্র, নিসর্গ, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা–১৮০।

১৬। অঞ্জন সেনের সাথে লেখক অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, ক্রোড়পত্র, নিসর্গ, ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় ‘‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা কেউ কেউ সত্যিই একটা বিকল্প ধরণ খুঁজছি” শীর্ষক অংশে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা– ১৬৫।

১৭। বিকাশ শীল সম্পাদিত, জনপদপ্রয়াস, বইমেলা জানুয়ারি, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা– ১১।

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা– ১১।

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা– ১২।

২০। ঐ, পৃষ্ঠা– ১২।

২১। ঐ, পৃষ্ঠা– ২০, ২১।

২২। অঞ্জন সেনের সাথে লেখক অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, ক্রোড়পত্র, নিসর্গ, ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় ‘‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা কেউ কেউ সত্যিই একটা বিকল্প ধরণ খুঁজছি” শীর্ষক অংশে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা– ১৬৫।

২৩। বজলুল করিম বাহার- এর মুখেমুখি অভিজিৎ সেন, ক্রোড়পত্র, নিসর্গ, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। পৃষ্ঠা– ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯।

২৪। বিকাশ শীল সম্পাদিত, জনপদপ্রয়াস, বইমেলা জানুয়ারি, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা– ৮।

২৫। অঞ্জন সেনের সাথে লেখক অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, ক্রোড়পত্র, নিসর্গ, ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় ‘‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা কেউ কেউ সত্যিই একটা বিকল্প ধরণ খুঁজছি” শীর্ষক অংশে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা– ১৬৫।

২৬। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বস্তুত অভিজিৎ বেশিরভাগ উত্তর লিখিতভাবেই দিয়েছেন। আমরা লিখিত অংশই উদ্বৃতি চিহ্নের মধ্যেই রাখছি।